Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 449–463
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

লোকায়ত বিজন ভট্টাচার্যের সমাজেতিহাস পাঠ ও নাটকের বিকল্প প্রস্থানভূমি

ফণিভূষণ মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা
ই-মেইল : mondalphanibhuson@gmail.com

সুনিমা ঘোষ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা
ই-মেইল : sunimaghosh70@gmail.com

Keyword
বিজন ভট্টাচার্য, লোকায়ত দর্শন, সমাজেতিহাস পাঠ, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বামপন্থা, নাট্যদর্শন ও প্রকরণ

Abstract
বিজন ভট্টাচার্য 'জীবনবোধ'-এর মধ্যেই অনুভব করেছিলেন 'জীবন-যন্ত্রণা', যা তাঁর মধ্যে নাট্য-যন্ত্রণা বাড়িয়েছিল এবং তার মধ্য দিয়ে তিনি 'শিল্পবোধ' ও 'নাট্যবোধ'-এ উপনীত হন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, 'জীবন-যন্ত্রণা'-র আবেগই কি প্রধান হয়ে উঠেছিল তাঁর 'শিল্পবোধ'-এ, নাকি তিনি আবেগের সঙ্গে যুক্তি-শৃঙ্খলার কার্য-কারণ সূত্রটিকে সংযুক্ত করে 'শিল্পবোধ' থেকে 'নাট্যবোধ'-এ উপনীত হয়েছিলেন? তাঁর 'জীবনবোধ' ও 'জীবন-যন্ত্রণা'র সঙ্গে জড়িয়ে ছিল জনসাধারণ, যে-কারণেই তিনি জানিয়েছেন—

"নাটক বলতে আমি তো বুঝি direct clash with the people, direct contact with the people."

প্রশ্ন তোলাই যায়— 'people'-এর সঙ্গে 'direct clash' ও 'direct contact' কিভাবে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে সম্ভবপর হল? তিনি তাঁর নাটকে 'people' বলতে কাদের বুঝিয়েছেন? আমাদের পুনরায় অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে হয় নাট্যকারের ভাষ্যে— তাঁর দর্শনে জনসাধারণ ('people') শহুরে 'Bhaddorloks people' নয়, মাটির গন্ধমাখা গ্রামের 'চাষাভুষো people' — যাদের নিজস্ব সংস্কার, সংস্কৃতি, ধর্ম-বিশ্বাস এবং জীবন সংগ্রাম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁর 'জীবনবোধ', 'শিল্পবোধ' এবং 'নাট্যবোধ'-এর মধ্যে জনসাধারণ এমন কি প্রভাব ফেলেছিল, যে কারণে তিনি নিজেকে 'জনসাধারণের শিল্পী' বলে দাবি করেছেন এবং তিনি কেনই বা 'জনসাধারণের চৈতন্য'-এ নিজের 'নাট্যশিল্প'-র মুক্তি চেয়েছিলেন? অন্যদিকে শুধুমাত্র 'রাজনৈতিক বামপন্থা' প্রভাবিত শিল্পকর্মের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তিনি কেন 'সাংস্কৃতিক বামপন্থা'-র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লোকায়ত 'মানুষের জান-এর লড়াইয়ের সঙ্গে প্রাণের লড়াই'-কে তাঁর নাটক ও নাট্যে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন? বিজন ভট্টাচার্যের শিল্পকর্ম ও নাট্যকর্মের মধ্যে আমাদের অন্বিষ্ট তিনি কিভাবে লোকায়ত সংস্কৃতির আঙ্গিনায় বৃহত্তর সমাজেতিহাসের প্রেক্ষিতে তাঁর নাটকে এক বিকল্প প্রস্থানভূমি নির্মাণ করেছিলেন?

Discussion

বিজন ভট্টাচার্যের রচনাসংগ্রহ ১-এর ভূমিকা লিখতে গিয়ে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় একজায়গায় লিখেছেন-

> "সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজন ও অনিবার্যতায় মার্কসবাদী প্রত্যয়ে স্থিরবিশ্বাসী বিজন ভট্টাচার্য ১৯৪৩-৬১ সালের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে সমকালীন ইতিহাসের যে ক-টি ক্ষেত্র তথা সমস্যাকে তাঁর নাটকের প্রস্থানভূমি রূপে বেছে নিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটা ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রমও যেন পাঠ করা যায়।"[১]

এই বয়ান থেকে স্পষ্ট যে, বিজন ভট্টাচার্য একটা 'ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রম'-এর মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সমাজেতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নাটকের বিকল্প প্রস্থানভূমি নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কেননা, মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে তিনি যেমন আগুন, জবানবন্দী ও নবান্ন-র মতো নাটক লিখেছিলেন, তেমনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে জীয়নকন্যা, কিংবা মার্কিন মিলিটারির সঙ্গে বেদে সমাজের সংঘাত নিয়ে কলঙ্ক। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নতুন বাঙালি শিল্পপতিদের সঙ্গে শ্রমিকের দ্বন্দ্ব নিয়ে অবরোধ ও জতুগৃহ-এর মতো নাটক লিখেছিলেন, আবার স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েমকারী একদল জননেতাদের চিহ্নিত করেছিলেন জননেতা নাটকে। অন্যদিকে তিনি দেশভাগ এবং দেশভাগ-উত্তর উদ্বাস্তু মানুষের 'আবেগ ও অবস্থান'কে[২] গোত্রান্তর নাটকে ধরতে চেয়েছিলেন। এই 'ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রম'-এর মধ্য দিয়ে প্রায় দেড়-দশক জুড়ে তিনি রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সমাজেতিহাসের নানা সমস্যাগুলিকে তাঁর 'নাটকের প্রস্থানভূমি' হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন।

এক

বিজন ভট্টাচার্যের জীবনের প্রায় অর্ধেকটা (১৯১৫-১৯৪৭) কেটেছিল পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ও উপনিবেশবাদের প্রেক্ষাপটে, আর বাকি জীবনটা (১৯৪৮-১৯৭৮) অতিবাহিত হয়েছিল স্বাধীনতা-উত্তর সময়পর্বের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও উত্তর-উপনিবেশবাদের মধ্য দিয়ে। আবার তাঁর ছেলেবেলা (১৯১৫-১৯২৯) কেটেছিল পদ্মাপারের বৃহত্তর লোকায়ত গ্রামীণ সমাজ ও লোকসংস্কৃতির পটভূমিতে। তিন দশকেরও কম ব্যবধানে একদিকে পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪২) অভিঘাত, স্বাধীনতার স্বপ্নে অধীর ভারতবাসীর ভারতছাড়ো আন্দোলনের (বিয়াল্লিশের অগাস্ট আন্দোলন) জোয়ার, তেতাল্লিশের মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ এবং অন্যদিকে বামপন্থার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শে (বিশেষত 'সাংস্কৃতিক বামপন্থা'[৩]) অনুপ্রাণিত হয়ে গণনাট্য আন্দোলনের ভেতর দিয়ে পুনর্জন্ম হয়েছিল আর এক বিজন ভট্টাচার্যের, যিনি বাংলা নাটকের প্রচলিত পথে না হেঁটে নিজস্ব এক নতুন নাট্যপথের নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এই হয়ে ওঠার পশ্চাৎপটে ছেলেবেলার পারিবারিক সাংস্কৃতিক আবহ তাঁকে কিভাবে এবং কতখানি প্রভাবিত করেছিল? সেই সঙ্গে পদ্মাপারের বিস্তৃত গ্রামীণ লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে কিভাবে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ ও বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার বোধ গড়ে উঠেছিল?

বিজন ভট্টাচার্যের পিতা ক্ষীরোদচন্দ্র ভট্টাচার্য [৪] ছিলেন খানখানাপুর সুরাজমোহিনী ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক।[৫] তাঁর পিতা যে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং পারসিভাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের প্রিয় ছাত্র ছিলেন সে কথা তিনি এক সাক্ষাৎকারেই জানিয়েছিলেন।[৬] ক্ষীরোদচন্দ্র ভট্টাচার্যের দশ ছেলে মেয়ের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য সবার বড়ো সন্তান ছিলেন। বাকি চার ছেলে— বিমান, লালবিহারী, অরুণ, সলিল এবং চার মেয়ে— ইন্দিরা, মঞ্জুষা, মনীষা, মণিকা। সর্বশেষ কনিষ্ঠা কন্যার নাম জানা যায় না, কেননা সে মণিকার যমজ ছিল এবং শৈশবেই তার মৃত্যু হয়।[৭] তাছাড়া বিজন ভট্টাচার্যের এতজন ভাই বোন সম্পর্কে আর বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ক্ষীরোদচন্দ্র ভট্টাচার্য একাধারে যেমন ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক তেমনই আ-মৃত্যু আদর্শ জীবন-যাপন পালন করে ছিলেন, অন্যদিকে তাঁর ছিল গভীর সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রীতি এবং শেক্সপিয়র চর্চায় তিনি ছিলেন বিশেষ অনুরাগী। তিনি একাই যে শেক্সপিয়র চর্চা করতেন তা নয়, বরং স্ত্রী ছেলে মেয়েদের নিয়ে একসাথে শেক্সপিয়র পাঠাভিনয় করতেন, তার সাক্ষ্য মেলে বিজন ভট্টাচার্যের নিজের জবানীতে—

"বাবা আমাদের শেক্সপিয়র করাতেন। দশ বছর বয়সে যখন শেক্সপিয়র বুঝি না, সেই বয়সেই শেক্সপিয়র recite করতে পারতাম। মনে আছে, মা পোরশিয়া করেছেন, বাবা শাইলক, আমরা অন্য পার্টে।"[৮]

তিনি দশ বছর বয়সে না বুঝলেও শেক্সপিয়রের কবিতা আবৃত্তি[৯] করতে পারতেন, বাবা মা-র সঙ্গে শেক্সপিয়রের নাটক পাঠাভিনয় করতেন। সেই সঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন—

"বাড়িতে শেক্সপিয়র-এর অনুবাদ ছিল; পড়ে দেখেছি, ভালো লাগেনি।"[১০]

ভালো না লাগলেও ওই বয়সে তাঁর পাশ্চাত্য ধ্রুপদী নাট্য সাহিত্যের সঙ্গে একটা প্রাথমিক পরিচয় ঘটেছিল বাবার হাত ধরে। তবে তাঁর নাটকের বিষয় নির্বাচন ও আঙ্গিক নির্মাণের সঙ্গে শেক্সপিয়রের নাট্যরীতির বিশেষ কোনো প্রভাব ছিল না। এই যে পারিবারিক একটা সাংস্কৃতিক আবহ— যেখানে বাবার পাশাপাশি মা সুবর্ণপ্রভা দেবীও[১১] কিন্তু শিক্ষিতা এবং সংস্কৃতিমনা, শেক্সপিয়র পড়ছেন, পোরশিয়া চরিত্রে অভিনয় করছেন— যা বিজন ভট্টাচার্যের ছেলেবেলার মানস গঠনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত করছিল।

পারিবারিক সাংস্কৃতিক আবহের পাশাপাশি গ্রামীণ সংস্কৃতিও বিজন ভট্টাচার্যকে ছেলেবেলা থেকেই ভীষণভাবে আকৃষ্ট করতো। তিনি দূর থেকেই শুধু গ্রামীণ সংস্কৃতি দেখতেন না, নিজের মতো করে অংশগ্রহণও করতেন, লোকশিল্পীদের রীতি-নীতি হাব-ভাব কায়দা-কানুন নিজের মধ্যে আত্মস্থ করতেন, তাদের সাথে মিশতেন। এই গ্রামীণ লোকায়ত সংস্কৃতিরও তিনি যেন একটি অংশ হয়ে উঠতেন। তাঁর নিজের কথোপকথন থেকেই জানা যায় —

"সরস্বতী পুজোর সময় গ্রামে থিয়েটার হত। যাত্রা, কথকতা, ঢপেরও চলন ছিল। আমিও কথকতা করেছি, লোকে শুনতে এসেছে। মুকুন্দ দাসের যাত্রা দেখেছি।"[১২]

এই বয়ান থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনি ছেলেবেলা থেকেই লোকনাট্যের আলাদা আলাদা ঘরানার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। একদিকে যেমন গ্রামীণ থিয়েটার ও যাত্রা, বিশেষ করে মুকুন্দ দাসের যাত্রা তিনি দেখেছেন, অন্যদিকে তেমনই কথকতা ও ঢপ দেখেছেন এবং নিজেও অল্পবয়সে কথকতা পরিবেশন করেছেন। ছেলেবেলায় লোকনাট্যের এত বিচিত্র অভিজ্ঞতা কতখানি বিজন ভট্টাচার্যের পরবর্তী নাট্যজীবনকে প্রভাবিত করেছিল?

এসবের বাইরেও বিজন ভট্টাচার্যের আর একটি নিজস্ব বৃহত্তর ভালোলাগার জগৎ ছিল এবং সেখানে ছিল আলাদা পেশার বহু বিচিত্র লোকায়ত মানুষ, যাদের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সংযোগ খুব ছোটোবেলাতেই গড়ে উঠেছিল। পিতার বদলি চাকরির সূত্রে তিনি খুলনা, যশোর, বসিরহাট, সাতক্ষীরার নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ফকির-আউল-বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশেছেন, গান শুনেছেন, আখড়ায় গেছেন, থেকেছেন, গান শিখেছেন। তিনি 'পাড়াগাঁয়ের ছেলে'[১৩] হওয়ার সুবাদে খুব সহজেই এই মানুষদের সঙ্গে মিশে যেতে পারতেন এবং তাদের সুখ-দুঃখ, সংস্কার-সংস্কৃতি, বিশ্বাস, কর্মপটুতা, ভাবভঙ্গী, চাল-চলন, মুখের ভাষা ও গান সমস্তটাই নিজের 'সহজাত এবং অর্জিত কিছু ইনটেলিজেন্স'[১৪] দিয়ে অনায়াসে সেসব আয়ত্ত করতে পারতেন। আসলে এই বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে তিনি অন্তর থেকে নিজেকে মেলাতে চাইতেন, তাঁর সেই আকুতি আরও গভীরভাবে ধরা পড়ে নিজেরই বয়ানে —

"আমার ভীষণ ভালোলাগত ওদের সঙ্গে থাকতে এবং মিশতে এবং জানতে। Most of my days I spent with them in the villages, with the people. কাজেই ওদের reaction কী হয়, ওরা কেমন করে কথা বলে, অসুখে কি করে কষ্ট পায়, কী কী ভাবে কষ্ট পায়, what are the sources of their trouble, সেগুলো জানা ছিল। আমি এদের ভালো চিনতাম, বুঝতে পারতাম। এই মাটিটাকে খুব চিনতাম এবং ভাষাটাও জানতাম, ... আমি যেটা দেখেছি, আমাদের সমস্ত ধ্যান-ধারণা, art forms, কালচার-ফালচার, whatever it is, একেবারে pure and simple কৃষিভিত্তিক।"[১৫]

'ওদের' বলতে তিনি কাদের কথা বলতে চেয়েছেন? কেনই বা তিনি 'ওদের' সাথে 'থাকতে', 'মিশতে' ও 'জানতে' ভালোবাসতেন? আর কিভাবেই বা তিনি খুব সহজেই 'ওদের' সুখ-দুঃখের অনুভূতি ও অভিব্যক্তি এবং ভাষাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন? বিজন ভট্টাচার্য 'ওদের' বলতে মালো, কুমোর, বেদে, জেলে, টুনে, চাষা, ফকির ও আউল-বাউল সম্প্রদায়ের মানুষদের কথা বলতে চেয়েছিলেন। এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিচিত্র ও বহুমুখী। এই বিচিত্র পেশার মানুষদের কত কাছ থেকে, কত গভীর সহানুভূতি থেকে তিনি তাদের দেখেছেন, জেনেছেন, মিশেছেন এবং আত্মীকৃত উপলব্ধি পরবর্তী সময়ে তাঁর নাটক ও নাট্যে প্রয়োগ করেছেন। এই সকল মানুষদের হাতের কাজ যে তিনি শুধুমাত্র মন দিয়ে দেখতেন তা নয়, বরং তাদের কাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৃৎকৌশল বোঝার চেষ্টা করতেন গভীর মনোযোগ সহকারে। কেননা, এদের কাজের যে নিজস্ব একটা শিল্পগত দিক আছে সেটাকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাই তিনি এই সকল আলাদা আলাদা কাজে যুক্ত মানুষদের (শুধু মালো নয়, কুমোর, টুনে, জেলে, চাষা প্রমুখ নানা মানুষদের) 'village artisans'[১৬] বা 'গ্রামীণ কারিগর' বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। এরাই কি তবে পরবর্তীতে তাঁর নাটকের আখ্যানে ঢুকে পড়বে নানাভাবে?

বিজন ভট্টাচার্য তাঁর জীবনচর্যায় যেমন, নাট্যচর্চায়ও তেমন গ্রামীণ সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে প্রকাশ করেছেন, যা সম্পূর্ণত 'pure and simple কৃষিভিত্তিক'। তাদের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, যার গভীরে লোকায়ত মানুষের সংস্কার ও সংস্কৃতি জড়িয়ে আছে ওতোপ্রোতভাবে। বিজন ভট্টাচার্যের আগুন থেকে হাঁসখালির হাঁস পর্যন্ত প্রায় সমস্ত নাটকে এই লোকায়ত সংস্কৃতির নানা স্তর, নানা মাত্রা দেখা যায়। বিশেষ করে জীয়নকন্যা, দেবীগর্জন, গর্ভবতী জননী প্রভৃতি নাটকে বিভিন্ন জাতি-উপজাতি-সম্প্রদায়ের মানুষ ও সমস্তটা মিলিয়ে তাদের সংস্কার ও সংস্কৃতিকে বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাট্যভাষায় ধরতে চেয়েছেন। কেননা তিনি ছেলেবেলার লোকায়ত গ্রামীণ সমাজ ও লোকসংস্কৃতির বিচিত্র ও বহুমুখী জীবনাভিজ্ঞতাকে তাঁর নাটকগুলিতে দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন, তাঁর নিজের জবানীতেও তেমনই ইঙ্গিত মেলে -

> "খানিকটা জীবনবোধ থেকে আসে শিল্পবোধ, আর শিল্পবোধ থেকেই আসেই নাট্যবোধ। আমি মাধ্যমটা নিয়ে ভীষণ কষ্টে পড়ি। Form নিয়ে, যে how to express myself? আমি তো আঁকিয়ে, গাইয়ে বা বাজিয়ে নই। তা আমি কী করে শিল্পের মাধ্যমে জীবনবোধ সঞ্চারিত করব? তো শিল্পের মাধ্যমটা ধরতে খুব অসুবিধায় পড়ি। সত্যিকারের এই জীবন-যন্ত্রণা ছিল বলেই এই নাটকের যন্ত্রণা শুরু হল।"[১৭]

বিজন ভট্টাচার্যের এই বক্তব্যের সূত্র ধরেই আমরা দেখে নিতে চাইবো কিভাবে তাঁর নাটকে বৃহত্তর 'জীবনবোধ'-এর (গ্রামজীবন, ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সমকালীন প্রেক্ষিত) মধ্যে 'জনসাধারণেরই আমি' এবং 'আমারই জনসাধারণ'-কে উপলব্ধি করে 'শিল্পবোধ'-এর মধ্যে নিজেকে 'জনসাধারণের শিল্পী' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন? বিজন ভট্টাচার্যকে নিয়ে লেখা একটা কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

> "নীলকণ্ঠ তুমি, তুমি অভিমন্যু ব্যূহের ভিতরে/দিগ্বিজয়ী, ঢুকে গেছে, কিছুতেই বেরুতে পারছো না—/এই ভালো, কাজ নেই, জীবনে ও নাট্যে দুঃখ আছে।"[১৮]

'জীবনে ও নাট্যে'-এর সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের যে গভীর যোগসাযোগ ছিল তা অজানা নয়, বরং তাঁর জীবনের সাথে নাট্য ও নাট্যের সাথে জীবন অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িয়ে ছিল, যেন একে অপরের পরিপূরক। নিজের নাটক এবং নাটকে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারে তাঁর অভিমতটি আমাদের ভাবিয়ে তোলে—

> "সব সময়ে নাটকের আমি থাকতে চাইনি। আমারই নাটক এমত লিখতে চেয়েছি।"[১৯]

বিজন ভট্টাচার্যের এই উপলব্ধ থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয় যে, তিনি 'নাটকের আমি'-র সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আটকে না থেকে 'আমারই নাটক'-এর বৃহত্তর অভিমুখে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই বৃহত্তর অভিমুখে কাদের

অবস্থান ছিল, আর কেনই বা তিনি তাঁর নাটকে তাদের ধরতে চেয়েছিলেন এবং তা কিভাবে? বিজন ভট্টাচার্যের উপরি-উক্ত জবানবন্দী কোনো বায়বীয় কল্পনা-প্রসূত নয়, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে তা অনেক বেশি জীবনবোধ-সঞ্জাত। তাই তিনি আরও স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন—

> "যেমন, জনসাধারণেরই আমি। ঠিকই। কিন্তু যদি বলি আমারই জনসাধারণ— কথাটাও তো সত্যি।"[২০]

এই কথার সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি 'নাটকের আমি' থেকে বেরিয়ে 'আমারই নাটক'-এর যে বৃহত্তর অভিমুখে বিজন ভট্টাচার্য যাত্রা করতে চেয়েছিলেন সেই অভিমুখটি ছিল জনসাধারণের দিকে। তিনি কি তবে জনসাধারণের মধ্যে থেকে জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়েই 'আমারই নাটক' নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন?

তিনি কিন্তু এখানেই থেমে থাকতে চাননি, বরং 'জনসাধারণের শিল্পী' হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন এবং তা তিনি অন্তর থেকে বিশ্বাস করতেন বলেই প্রশ্ন তুলেছিলেন—

> "জনসাধারণের শিল্পী হয়ে খুশি হতে বাধা কি?"[২১]

'জনসাধারণের শিল্পী' হিসেবে নিজেকে দেখতে চাওয়া এবং একই সঙ্গে নিজেকে গড়ে তোলার ব্যাপারে বিজন ভট্টাচার্য কিন্তু শিল্পীর দায়বদ্ধতা ও কর্তৃত্বের দিকেও সদা সতর্ক ছিলেন। অকপটেই সে-কথা তিনি স্বীকারও করেছেন —

> "শিল্পী হিসেবে জনসাধারণের ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার যে-দিন থাকবে না, সে দিন আপনা থেকেই শিল্পী খারিজ হয়ে যাবে।"[২২]

শিল্পী হিসেবে তিনি কখনও খারিজ হতে চাননি, কোনো প্রকৃত শিল্পীই তা চায় না। বাংলা নাটক ও থিয়েটারের ইতিহাস তলিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, চারের দশকের গোড়াতেই গণনাট্যের ভেতর দিয়ে বিজন ভট্টাচার্য 'জনসাধারণের শিল্পী' হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ পর্বে ইতিহাস (বাংলা নাটক ও থিয়েটারের সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস) কি তাঁকে শিল্পীর সেই মান্যতা অক্ষুণ্ণ রাখতে দিয়েছিল, নাকি কায়দা করে সচেতনভাবে (অবহেলায় ও অনাদরে) শিল্পী হিসেবে তাঁকে প্রকারান্তরে খারিজই করেছিল?

বিজন ভট্টাচার্যের মননে ও জীবনাভিজ্ঞতায় ছেলেবেলা থেকেই লোকায়ত মানুষ এবং তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও সংস্কার গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল। আর এই লোকায়ত শব্দের সঙ্গেই তো জড়িয়ে আছে জনসাধারণের দর্শন, যা প্রকারান্তরে বস্তুবাদী দর্শনকেও চিহ্নিত করে। আসলে লোকায়ত বলতে বোঝায় সাধারণ লোকের দর্শন অর্থাৎ 'লোকেষু আয়তো লোকায়তঃ'।[২৩] লোকায়ত মানে ইহলোক দর্শন, কেননা লোকায়তিকদের কাছে এই মাটির পৃথিবীটাই সত্য। তাদের কাছে চাষবাসের চেয়ে বড়ো বিদ্যা আর কিছুই ছিল না। তাই তাদের চেতনায় এই মূর্ত মাটির পৃথিবীই সবচেয়ে বড়ো সত্য। আসলে দেশের সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়ায় বিশ্বাস হারায়নি। এই খেটে খাওয়া লোকায়ত মানুষদের ছিল নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতি— যা বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে এক অভিনব নাট্যভাষার জন্ম দেয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দর্শনের সুচিন্তিত সমন্বয়ে। এরই পাশাপাশি আমরা যদি গণনাট্য সংঘের দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য ও ভূমিকা কি ছিল, তা তাদের প্রকাশিত ঘোষণাপত্র থেকে উদ্ধৃত করি তাহলে দেখবো যে,

> "সার্থক শিল্পসৃষ্টির জন্য আমাদের শিল্পকর্ম তাই জনগণের জীবন ও সংগ্রাম অর্থাৎ শ্রেণি সংগ্রামকেই উপস্থিত করবে এবং শ্রেণিহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষক ও অন্যান্য সকল স্তরের মেহনতী মানুষের সংগ্রামী মোর্চার সাংস্কৃতিক কাহিনিরূপে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।"[২৪]

গণনাট্যের ঘোষণাপত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শিল্পকর্ম যেমন জনগণের জীবন ও সংগ্রামকে প্রকাশ করবে, তেমনি শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার একটা মিলিত সংগ্রামও থাকবে। এই মেহনতী কৃষক ও শ্রমিকেরাই তো লোকায়তের অন্তর্ভুক্ত, যারা সম্যকভাবে চেষ্টা করে, উৎপাদনের জন্য শ্রম বিনিয়োগ করে, কৃষিকাজ করে।

অন্যদিকে লোকায়ত শব্দবন্ধটির মধ্যেই রয়েছে দুটি শব্দ- 'লোক' ও 'আয়ত'। 'আয়ত' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়- 'আ+যৎ+অ'। এই 'আ' উপসর্গের অর্থ হল সম্যকভাবে এবং 'যৎ' ধাতুর অর্থ চেষ্টা করা। তাই 'আয়ত' শব্দের অর্থ হল – 'সম্যকভাবে চেষ্টা করা'। অন্যদিকে 'লোক' শব্দের অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে মনিয়ার উইলিয়ামস্ 'লোক' শব্দটির সঙ্গে লাতিন শব্দ 'lucus' এবং লিথুনিয়ান শব্দ 'laucus' শব্দের তুলনা করেছেন। লাতিন 'lucus' শব্দের অর্থ 'a clearing of forest' অর্থাৎ চাষের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করার জায়গা, অন্যদিকে লিথুনিয়ান শব্দ 'laucus'-র অর্থও চাষের জমি। আবার সংস্কৃত ভাষায় 'লোক' শব্দের অর্থের সঙ্গেও চাষের জমির সম্পর্ক ছিল। কেননা 'লোক' শব্দের শুরুতেই একটা 'উ' থাকতো অর্থাৎ 'উ-লোক', মানে উরুলোক- তার অর্থও কিন্তু জমি বা মাঠ।[২৫] তাই লোকায়ত শব্দবন্ধের গভীরে কৃষকদের সংস্কার, সংস্কৃতি ও চেতনার কথা অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। এই 'চাষাভুষো people'-কেই সমাজেতিহাসের প্রজ্ঞা এবং গভীর পাঠ থেকে বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাটকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সে কারণেই কি তিনি শহুরে নাগরিক সংস্কৃতিকে প্রকাশ না করে নিজের 'শিল্পবোধ' ও 'নাট্যবোধ'-এর মধ্যে গ্রামীণ লোকায়ত সংস্কৃতিকে অভিব্যক্ত করেছিলেন? তাই কি কলকাতার ফুটপাতে মরতে মরতে পরান মণ্ডল গ্রামে ফেরার নির্দেশ দেয়? শুধু গ্রামে ফেরা নয়, পরান স্বপ্ন দেখে সোনা ধানের, নতুন করে ধান ফলানোর—

> "ঘরে ফিরে যা রমজান— তোরা সব ঘরে ফিরে যা। আমার সেই মরচে পড়া নাঙ্গল ক'খানা আবার শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতি। ...সোনা, বেন্দা, সোনা ফলবে। ফিরে যা। ফিরে যা।"[২৬]

এই সোনা ধান ফলানোর স্বপ্ন ও গ্রামে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা, যা আসলে শিকড়ে ফিরতে চাওয়ার ইঙ্গিত।

দুই

বিজন ভট্টাচার্য যখন গণনাট্য আন্দোলনে নিজেকে সংযুক্ত করছেন তখন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে নানা উত্থান-পতন, নানা সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও নিজেকে অংশীভূত করছেন। যেমন একদিকে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদ বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেমনি অন্যদিকে এদেশে বিয়াল্লিশের অগাস্ট আন্দোলন, মেদিনীপুরের ভয়ংকর বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর— সব মিলিয়ে সাধারণ জনজীবন অবিন্যস্ত। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার একটি পংক্তিতে সে ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট—

> "এদেশ বিপন্ন আজ; জানি আজ নিরন্ন জীবন।"[২৭]

এই 'বিপন্ন'তা আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে, আর এই 'নিরন্ন' অবস্থা গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। তারা বাধ্য হয়েছিল গ্রাম ছেড়ে, ভিটে-মাটি ছেড়ে, শহরের ফুটপাতে দু-মুঠো ভাতের জন্য ভিক্ষা করতে। এই দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের শোচনীয় জীবন্ত ছবি দেখতে পাই প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন ও চিত্তপ্রসাদের ছবিতেও।[২৮]

এই ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রকাশ ঘটেছিল একদল তরুণ শিল্পীদের হাত ধরে। এ-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অশোক মিত্রের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা যাক—

> "বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশক থেকে প্রধানত বামপন্থী চিন্তার নির্ভরে যে আশ্চর্য নতুন এক সাংস্কৃতিক উজ্জীবন বাঙালিদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল তার কেন্দ্রবিন্দুতে কিন্তু শোষিত, অবসানিত মানুষজনের প্রসঙ্গ।"[২৯]

শ্রী মিত্র যে 'নতুন এক সাংস্কৃতিক উজ্জীবন'-র প্রসঙ্গ আমাদের ধরিয়ে দেন, তা কিন্তু কোনও বায়বীয় কল্পনা প্রসূত নয়, অনেক বেশি মানব-প্রত্যয়-ভূমি সঞ্জাত কিছু মানুষের চেতনা-বিশ্বাস সমন্বিত ভাবাদর্শ— যা বামপন্থী চিন্তার প্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া, গড়ে ওঠা। এই ভাবাদর্শ কি শুধুই ইউটোপিয়া? যে-কোনও ভাবাদর্শ বা মতাদর্শের ক্ষেত্রে ইউটোপিয়ার একটা পরিমাণ অংশ থাকে কিংবা থাকতে বাধ্য, কিন্তু সেই ইউটোপিয়াকে বাস্তবায়িত করে তোলার একটা তাগিদ কাজ করে, নিরন্তন প্রচেষ্টা চলতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে যে 'সাংস্কৃতিক উজ্জীবন' ঘটেছিল তার কেন্দ্রে ছিল

Trisangam International Refereed Journal (tirj)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iii, July2022, tirj/July22/article-50
Website: www.tirj.org.in, Page No.449-463

শোষিত মানুষের প্রসঙ্গ, তাদের নিয়ে চিন্তা-চর্চা ও বিশ্লেষণের বহুস্তরিক বিন্যাস ধরে পড়েছে শিল্পকলার নানান মাধ্যমে ও সংরূপে। ওই একই প্রবন্ধে শ্রী মিত্র অন্য আর একটি চিন্তাসূত্রের সংযোগ করেছেন এভাবে -

> "এ সমস্ত আবেগ-আলোড়নের মুহূর্তেই ক্রমশ অন্য একটি চেতনার বিকাশ। গ্রামে শহরে বেশিরভাগ মানুষ গরিব, নিঃস্ব হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের জীবনেও একটি নান্দনিক দিক আছে, হরিষে-বিষাদে তাঁরা আবেগকে তাঁদের নিজেদের মতো করে বাইরে প্রকাশে করেন— গানের মধ্য দিয়ে, নাচের মধ্য দিয়ে, ...আমরা একটু সংস্কৃত করে পুরো ব্যাপারটাকে লোকসংস্কৃতি বলে অভিহিত করতে অভ্যস্ত হয়েছি, আসলে যা নিখাঁজ দীনসংস্কৃতি, দীনজন নিজেদের সাংস্কৃতিক চেতনা যেখানে উজাড় করে দেন। বিংশ শতকের বাঙালি উজ্জীবন এই দীনসংস্কৃতি থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করেছে।"[৩০]

চারের দশকে 'বাঙালি উজ্জীবন'-র কেন্দ্রে ছিল শোষিত মানুষের প্রসঙ্গ এবং তাদের সাংস্কৃতিক চেতনার প্রেরণা, যাকে শ্রী মিত্র লোকসংস্কৃতি না বলে 'নিখাঁজ দীনসংস্কৃতি' বলে চিহ্নিত করেছেন। সংস্কৃতির মাত্রা দেশ কালের ভিন্নতায় বদলে বদলে যায়। সে প্রসঙ্গেও তিনি আমাদের সতর্ক করে দেন— ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত বাঙালির মধ্যে যে এক বিশেষ ধরনের 'সাংস্কৃতিক উজ্জীবন' হয়েছিল, তা মূলত ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ও চিন্তা-চেতনার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সেই উজ্জীবনে 'দীনসংস্কৃতি'-র কোনো উল্লেখ ছিল না, 'পুরো কাঠামোয় গরিব-গুর্বোদের কোনো স্থান নেই;'[৩১] বরং সেই উজ্জীবনে ছিল 'হীন সংস্কৃতি'[৩২] বা 'কদর্য সংস্কৃতি' সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস। 'শতবর্ষে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র' নামক অন্য আর একটি প্রবন্ধে শ্রী মিত্র বিশ শতকের মাঝামাঝি বামপন্থী আদর্শের প্রেক্ষিতে 'সাংস্কৃতিক উজ্জীবন'-কে 'মস্ত দ্বিতীয় উজ্জীবন'[৩৩] বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কেননা, এই উজ্জীবনের মূলে শুধু বামপন্থী-চেতনা নয়, দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তিনি সম্পর্কান্বিত করার চেষ্টা করেছেন এভাবে -

> "বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে হয়তো বামপন্থী আদর্শের সূত্র ধরে এই বাঙালি সমাজেই অন্য একটি উজ্জীবন ঘটেছিল– দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক ভুল বোঝাবুঝি, দেশভাগের পরিণামে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের আর্তনাদ– এই সমস্ত কিছুকে জড়িয়ে, এই সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে বাঙালির একটা নতুন প্রাণশক্তির বিকাশ ঘটেছিল সেই সময়কার কাব্যে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, সংগীতচর্চায়, নৃত্যকলায়, ভাস্কর্যে। সেগুলি নিয়ে এখনও তেমন কোনো চর্চা হয় না। সেই যে মস্ত দ্বিতীয় উজ্জীবন, তার প্রধান হোতাদের অনেকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই শতকের প্রথম দুটি দশকে।"[৩৪]

চারের দশকে বাঙালি সমাজ ও চেতনায় 'একটা নতুন প্রাণশক্তির বিকাশ'-এর মধ্য দিয়ে যে 'মস্ত দ্বিতীয় উজ্জীবন' তথা 'সাংস্কৃতিক উজ্জীবন' ঘটেছিল বলে শ্রী মিত্র মনে করেন, সেই ভাবনাকে শ্রদ্ধেয় শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য একটি স্তরে— জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে 'সাংস্কৃতিক বামপন্থা' বা 'কালচারাল লেফ্ট'[৩৫] অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। কেননা, যে-কোনো সংস্কৃতি বা 'সাংস্কৃতিক উৎপাদন' একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠে। আসলে এই সংস্কৃতি কোনো বায়বীয় পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠা নয়, সেখানে আছে কিছু মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শকে বাস্তবায়িত করার আ-প্রাণ প্রচেষ্টা— এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃতিকে এভাবে দেখতে চেয়েছেন -

> "সংস্কৃতিকে যদি এইভাবে দেখি, স্বভাবতই তা রাজনীতির আবর্তের মধ্যেই প্রোথিত। রাজনীতির ধারা বা প্রবণতাই সংস্কৃতির মূল আবহটি যেমন তৈরি করে, তেমনই আবার রাজনীতির সবচেয়ে শক্তিমান পক্ষের শাসন-প্রভাবে-নিয়ন্ত্রণে 'নির্মিত' সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বঞ্চিত, অবদমিত পক্ষ আর এক প্রতিবাদী সংস্কৃতি চিহ্নিত করে এক প্রতিবাদী রাজনীতির 'জমি' তৈরি করে।"[৩৬]

আসলে সংস্কৃতি কোনো না কোনোভাবে রাজনৈতিক আবহ, পরিমণ্ডল ও পরিকাঠামোর ভেতর থেকে গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে— সেইসঙ্গে নিজস্ব একটা পথ অন্বেষণ করে, নির্মাণ করে। পাশাপাশি রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে যে 'নির্মিত'

সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে, যেখানে 'রাজনৈতিক বামপন্থা'-র প্রভাব এবং 'দল'-এর নিয়ম নীতি নির্দেশিকার শাসন থাকে, সেখানে 'প্রতিবাদী সংস্কৃতি'-র বি-নির্মাণ হয়— 'রাজনৈতিক বামপন্থা'-র বাইরে বেরিয়ে 'সাংস্কৃতিক বামপন্থা' নির্মাণের মধ্যে। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যটি এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাক-

> "দুই মহাযুদ্ধের অর্ন্তবর্তী কালে যুদ্ধের ছায়ার বিস্তারেই আন্তর্জাতিক বামপন্থী সংস্কৃতির একটা ভাবাদর্শ তৈরি হচ্ছিল। বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে এই বামপন্থী সংস্কৃতির ভাবাদর্শগত ঘনিষ্ঠতা থাকলেও সাংস্কৃতিক সৃষ্টি কর্ম তথা সাংস্কৃতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক কর্মসূচির সীমা লঙ্ঘন করে একটা বামপন্থী সাংস্কৃতিক বাতাবরণ রচনার দিকেই এই বামপন্থী সংস্কৃতি তার লক্ষ্য স্থির করেছিল।"[৩৭]

বামপন্থী রাজনীতি ও বামপন্থী সংস্কৃতির মধ্যে ভাবাদর্শগত বোঝাপড়া থাকলেও সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকর্ম বা সাংস্কৃতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রটি বামপন্থী রাজনীতির মতাদর্শের মধ্যেই পার্টি বা দলের বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা ও কর্মসূচির বাতাবরণে সীমিত ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব-রাজনীতি ও সংস্কৃতির মানচিত্রে নানান পট পরিবর্তন ও বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের সৃজন এবং মননকর্মে সাধারণ মানুষের ওপর রাষ্ট্র ব্যবস্থার শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুক্তির লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার দায়বদ্ধতা অনুভব করেছিলেন বামপন্থী রাজনীতির মতাদর্শ থেকে। কিন্তু কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে এবং নির্দেশে যখন শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের নিজস্ব মানবিকবোধ, বিশ্বাসের ভূমি, ন্যায় অন্যায় ও মূল্যবোধগুলিকে 'শ্রেণিগত সংস্কার' হিসেবে দেগে দেওয়া হল, একই সাথে দলের নির্দেশ মানতে বাধ্য করা হল; তখনই বামপন্থী রাজনীতির ভূমিতে গড়ে ওঠা 'নির্মিত' সংস্কৃতির বিরুদ্ধে 'প্রতিবাদী সাংস্কৃতি'-র জন্ম হয় বামপন্থী সংস্কৃতির আবহে।

বিজন ভট্টাচার্য ১৯৪২ সালে 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এ যোগ দেন। পরের বছর মে মাসে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের মঞ্চ থেকেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জন্ম হয়। আমরা সকলেই এ-কথা জানি যে, বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটক ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় বাংলা থিয়েটারে একটি সাংস্কৃতিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করে কাজ করতে চাওয়ার কারণে পার্টির সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের একটা 'ideological clash'[৩৮] হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করেন। কমিউনিস্ট দল ও নেতাদের চাপানো শৃঙ্খলে নিজের ব্যক্তি ইচ্ছে, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ— এ সমস্ত কিছুকে তিনি পার্টির কাছে বিলিয়ে দিতে চাননি। কেননা, রাজনৈতিক নেতা ও সাংস্কৃতিক শিল্পীর দর্শন, মনন ও সৃজনের মধ্যে ভাবাদর্শগত ঘনিষ্ঠতা থাকলেও একটা নিজস্ব ক্ষেত্র বা ভূমি থাকে। সেই প্রসঙ্গটি তিনি আমাদের এভাবে ধরিয়ে দেন—

> "রাজনীতিক দেখবে এক চোখে। কেননা দু-চোখ খুলে দেখবার ব্যাপারটা তাঁর ধর্মে বারণ আছে। কিন্তু শিল্পী দেখবেন তাঁর খোলা দু-চোখে। সাধারণ মানুষের জান-এর লড়াইয়ের সঙ্গে প্রাণের লড়াইও তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে।"[৩৯]

এই দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ সমন্বয় ও সংযোগ ঘটেনি বলে চারের দশকে গণনাট্য সংঘ তথা দল (কমিউনিস্ট) ছেড়ে বেরিয়ে যান বহু শিল্পী। আসলে শিল্পী যদি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পদতলে দলের স্বার্থে ও দলের নির্দেশ মেনে নিশ্চিন্তে থাকতে চায়, তখনই বৃহত্তর সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিপদের ছায়া পড়ে। তাই শিল্পীর দু-চোখ খোলা রাখা জরুরী। বিজন ভট্টাচার্যের এই দৃষ্টিভঙ্গির কথা মাথায় রেখে রাজনৈতিক বামপন্থার সঙ্গে সাংস্কৃতিক বামপন্থার সম্পর্কের সংযোগ ও সমন্বয় কেমন হবে তার একটি যুক্তিগ্রাহ্য অভিমত জানিয়েছেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়—

> "রাজনৈতিক বামপন্থা যখন ক্ষমতা থেকে দূরে, তখন সাংস্কৃতিক বামপন্থা তার রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে যতটা যত্নবান হবে, ক্ষমতার সময় ততটাই বিচারশীল হবে।"[৪০]

এই 'সাংস্কৃতিক বামপন্থা'-র আদর্শকে, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বিজন ভট্টাচার্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 'মানুষের মুক্তিতেই নাট্যশিল্পের মুক্তি'-র[৪১] সত্যান্বেষণে অবিচল ছিলেন।

তিন

কলকাতায় আসার পর বিজন ভট্টাচার্য কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (আবৃত্তি, গান ও নাটকে অভিনয়), জাতীয় আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে একের পর এক জড়িয়ে পড়েন এবং পড়াশোনায় ছেদ পড়ে। ছাত্র রাজনীতির সুবাদে কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়, তাদের মধ্যে ছিলেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সরোজ দত্ত, বিনয় ঘোষ, অরুণ মিত্র, অনিল কাঞ্জিলাল, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রমুখ। এই সময় অর্থাৎ **১৯৩৭** সালের শেষ দিকে অথবা **১৯৩৮** সালের গোড়ায় আনন্দবাজার পত্রিকা-র সম্পাদক নিজের বড়মামা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সুবাদে তিনি এই পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজ শুরু করেন।[৪২] এই সময় তিনি রেবতী বর্মণের মার্কসবাদ বিষয়ক একটি রিভিউ করেন, সেই রিভিউ পড়েই মুজফ্ফর আহমদ তাঁর খোঁজ করেন এবং তাঁর সাথে দেখা করার জন্য ডেকে পাঠান। সেই সূত্রেই মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে তাঁর আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও একটা যোগাযোগ গড়ে ওঠে। অন্যদিকে **১৯৩৯** সালের গোড়ার দিকে তিনি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন, টিবি ধরা পড়ে এবং যাদবপুর টিবি হাসপাতালে ভর্তি হন। ফলে চিকিৎসার জন্য যাদবপুর টিবি হাসপাতালে তাঁকে এক বছরের অধিক সময় থাকতে হয়েছিল।[৪৩] এই অবসরে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া প্রচুর বই পড়েছেন— যার মধ্যে ইবসেনের নাটকের বইও ছিল এবং রোগীদের নিয়ে নাটক করেছিলেন—

> "হাসপাতালে I dramatized, directed and acted চিকিৎসা সংকট আর বিরিঞ্চিবাবা।"[৪৪]

গণনাট্যে পর্বে আমরা যে নাট্যকার, নির্দেশক ও অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্যকে দেখবো এ-যেন তার আগাম মহড়া।

তিনি যাদবপুর হাসপাতাল থেকে ফিরে পুনরায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় যোগ দেন, কিন্তু মামা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে বেরিয়ে এসে 'অরণি পত্রিকা' প্রকাশের অল্প কয়েক মাস পরেই **১৯৪১-৪২** সাল নাগাদ তিনিও পদত্যাগ করেন।[৪৫] কেননা, সাংবাদিকতার ধরাবাঁধা ছকে কাজ করা, প্রতিবেদন কিংবা ফিচার লেখার মধ্যে তিনি নিজেকে আটকে রাখতে চাননি। বন্ধুদের ডাকে তিনি মাঝেমধ্যেই পত্রিকার দপ্তর থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতেন, গল্প-আড্ডা জমিয়ে তুলতেন, আর মানুষের বিচিত্র জীবনটাকে তাঁর অনুসন্ধানী মন ও সজাগ দৃষ্টি দিয়ে দেখতেন। এই প্রসঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধু জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

> "আনন্দবাজার পত্রিকার দপ্তর থেকে ফুসলিয়ে যখন আমরা বাইরে নিয়ে আসতাম তাকে, তখন মনে হত জীবনের এক উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গকে নিয়ে চলেছি খুব বড়ো করে মশাল জ্বালাবার কাজে লাগাবার জন্য।"[৪৬]

বিজন ভট্টাচার্যের ভেতর 'মশাল জ্বালাবার' জন্য যে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছিল তার প্রমাণ আমরা বছর দুই-তিন পরে আগুন থেকে জবানবন্দী হয়ে নবান্ন নাটকে এসে দেখতে পাই। এর মূলে প্রোথিত ছিল বিজন ভট্টাচার্যের "জীবনকে আস্ত আঁকাড়া জানবার ও দেখবার উদগ্র আগ্রহ।"[৪৭] এই সহজাত অভ্যাসটি তিনি শহরে এসেও ছাড়েননি। সেই সময় একদিকে যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে, ফ্যাসিবাদ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে এবং সেই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কালোবাজারি, মজুতদারি ও মুনাফাবাজির ফলে বাজারের মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিয়াল্লিশের অগাস্ট আন্দোলন বা ভারতছাড়ো আন্দোলন এবং মাতঙ্গিনী হাজরাকে গুলি করে মারার নৃশংস ঘটনা ঘটছে, অন্যদিকে তখন মেদিনীপুরে প্রবল বন্যার ফলে তেতাল্লিশের মন্বন্তর, অনাহারে না খেতে পেয়ে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসা কাতারে কাতারে মানুষের মৃত্যু— এই সমস্ত ঘটনা বিজন ভট্টাচার্যকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই সমস্ত পিঠোপিঠি ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর তিনটি নাটক লেখেন— 'আগুন', 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'।

বিজন ভট্টাচার্য আগুন নাটকটি রচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে এক সাক্ষাৎকারে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন —

> "এই শহরের উপর যুদ্ধের ভয়ংকর ছায়াপাতের একটা লক্ষণ দেখেছিলাম কিউইং-এর মধ্যে — জলের কিউ, চালের কিউ। রেশন বয়-দের যেন একটা শ্রেণিই গড়ে উঠেছিল। এই ব্যাপারটা নিয়েই খণ্ড খণ্ড কয়েকটি চিত্র রচনা করেছিলাম।"[৪৮]

'আগুন' প্রথম প্রকাশিত হওয়ার (অরণি, ২৩ এপ্রিল ১৯৪৩) ছ'মাস পরেই ২৯ অক্টোবর ১৯৪৩ সালে অরণি পত্রিকায় জবানবন্দী বেরোয়। বিজন ভট্টাচার্য তাঁর এই নাটক লেখার পেছনে প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতার কথা শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুনিয়েছিলেন-

> "ডি এন মিত্র স্কোয়েরের পাশ দিয়ে রোজ আপিস যাই। রোজই দেখি, গ্রামের বুভুক্ষু মানুষের সংসারযাত্রা। নারী পুরুষ শিশুর সংসার। দেখি বললে ঠিক বলা হবে না। আমি লজ্জায় চোখ তুলে ওদের দিকে তাকাতে পারতাম না। চোখ না তুলেও যেতে যেতে ওদের উপস্থিতি টের পেতাম। এক একদিন রাস্তার ওপরেই শায়িত মৃতদেহ, নোংরা কাপড়ে ঢাকা। মৃতদেহগুলো যেন জীবিত মানুষের চেয়ে অনেক ছোটো দেখায়। বয়স্ক কি শিশু আলাদা করা যায় না। আপিস যাওয়ার পথে অন্য দৃশ্য দেখি। টেলিগ্রাফের তার কাটতে গিয়ে পুলিশের গুলি খেয়ে পাকা ফলের মতো টুপ করে রাস্তায় পড়ে অল্পবয়সি ছেলে। আমি নিজেও একদিন কলেজ স্ট্রিটে পুলিশের প্রচণ্ড মার খেলাম। আপিস থেকে ফিরবার পথে রোজই ভাবি, এই সবকিছু নিয়ে লিখতে হবে। কিন্তু কীভাবে লিখব? ভয় করে, গল্প লিখতে গেলে সে বড়ো সেনটিমেন্টাল প্যানপেনে হয়ে যাবে। একদিন ফেরবার পথে কানে এল, পার্কের রেলিঙের ধারে বসে এক পুরুষ আর এক নারী তাদের ছেড়ে আসা গ্রামের গল্প করছে, নবান্নের গল্প, পুজোপার্বণের গল্প, ভাববার চেষ্টা করছে, তাদের অবর্তমানে গ্রামে তখন কী হচ্ছে। আমি আমার ফর্ম পেয়ে গেলাম। নাটকে ওরা নিজেরাই নিজেদের কথা বলবে।"[৪৯]

এই বয়ান থেকে আমাদের সামনে কতগুলি বিষয় স্পষ্ট হয়, সেই সাথে এটাও বোঝা যায় যে কোন্ প্রেক্ষিত থেকে এবং কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিজন ভট্টাচার্য নাটক লিখতে শুরু করেন। **এক**, আন্তর্জাতিক (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের উত্থান) ও জাতীয় ক্ষেত্রে (ভারতছাড়ো আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ) অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ও তার অমানবিক পরিণতি, যে-কারণে কলকাতার ফুটপাতে পড়ে থাকা মৃত মানুষের দেহগুলোকে তাঁর 'জীবিত মানুষের চেয়ে অনেক ছোটো' বলে মনে হওয়ার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা করতে পারার ক্ষমতা। **দুই**, ঔপনিবেশিক শাসকের শক্তি প্রদর্শনের নমুনা হিসেবে অল্পবয়সি ছেলেদের গোরা পুলিশের হাতে নির্মমভাবে গুলি খেয়ে মরা এবং সেই সাথে নিজেও বেধড়ক মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা। **তিন**, বাস্তবের এই অমানবিক ঘটনা, যা তিনি প্রতিদিনের চলার পথে চোখ খোলা বা বন্ধ রেখে দেখেন, শোনেন তাদের নিয়ে লেখার তাগিদ অনুভব করেন ভেতর থেকে। যদিও তার আগে তিনি বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন, তবুও এই অভিজ্ঞতাকে গল্পে প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছেন তা যদি 'সেনটিমেন্টাল প্যানপেনে' হয়ে যায় এই ভেবে। **চার**, শেষ পর্যন্ত তিনি নাটক লেখার জোর পাচ্ছেন, প্রেরণা পাচ্ছেন রেলিঙের ধারে বসে নর-নারীর ফেলা আসা গ্রামজীবনের গল্প, তাদের নবান্ন ও পুজোপার্বণের গল্প শুনে। তিনি বাইরে থেকে নিজের মতো করে কিছু চাপিয়ে দিতে চাইছেন না, বরং গ্রামের চাষাভুষো মানুষ ওরা নিজেরাই যেন 'নিজেদের কথা' বলছে এই প্রকরণেই বা টেকনিকে নাটক লিখছেন। এইখান থেকেই কি তিনি তাঁর নাটকের বিকল্প প্রস্থানভূমি গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন?

যুদ্ধের ছায়ায় জনতার কিউ-এ যে আগুন-এর জন্ম হয়েছিল তার ভেতর দিয়েই গ্রাম থেকে আসা খেতে না পাওয়া পরাণ মণ্ডলেরা 'সোনাধানের নান্দীপাঠ'[৫০] করতে করতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে কলকাতার ফুটপাতে মারা যাবে, আর প্রধান সমাদ্দারেরা 'ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা'[৫১] বলতে বলতে 'গাঁতায় খাটা' চাষিদের নবান্ন উৎসবে গ্রামে ফিরে যাওয়ার একটা বৃহত্তর পটভূমিতে বিজন ভট্টাচার্যের হাতে 'নবান্ন' নাটক গড়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই জানিয়েছেন—

> "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আধিদৈবিক দুর্ঘটনা এবং দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে চূড়ান্ত একটা পরিণতির দিকে নিষ্ঠুরভাবে অগ্রসর হয়েছে। প্রত্যেকটি সমস্যা এমন বিরাট আর ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে যেন মনে হচ্ছে অনর্থ যা কিছু ঘটছে তার উপর মানুষের যেন কোনো হাত নেই। সচেতন বুদ্ধিজীবী মনও সংশয়ে আর বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় ঘূর্ণায়মান। চরমতম এমনই সেই দুঃসময়ে জবানবন্দী-র ইঙ্গিতের সূত্রধার শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার দেশ মেদিনীপুর জেলার পটভূমিকায় প্রধান সমাদ্দারের নতুন জবানবন্দীতে নবান্ন নাটক লিখতে বসলাম।"[৫২]

অন্যদিকে বিজন ভট্টাচার্যের জীবনাভিজ্ঞতায় ছিল বৃহত্তর বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক মহাদেশ— বিশেষ করে ভারতের গ্রামীণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি, নানা জাতি-উপজাতির মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি। জীয়নকন্যা নাটকে আমাদের পরিচয় হয় উলুপীর সঙ্গে, সে বেদে সর্দারের তরুণী কন্যা, সর্পদংশনে তার মৃত্যু হয়। তার প্রাণ ফেরানোর জন্য নাট্যকার হাজির করান নানান গুণীন সম্প্রদায়কে, কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, একক মন্ত্রোচ্চারণ কোনো কাজে আসে না— সম্মিলিত প্রয়াসে শেষ পর্যন্ত উলুপী প্রাণ ফিরে পায়। এই বেদে সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্ম-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতিকে একটা সাংস্কৃতিক সমন্বয় হিসেবে কি বিজন ভট্টাচার্য দেখাতে চেয়েছেন? একই সঙ্গে এই প্রশ্নও তোলা যেতে পারে তাঁর সঙ্গে সাপ, সাপুড়ে ও তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে কিভাবে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল? এক সাক্ষাৎকারে তিনি সে অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন—

> "আমাদের দেশে সাপ প্রচুর, ওস্তাদ সাপুড়েও অনেক। যখন ক্ষেতের কাজ থাকে না, তখনই সাপুড়েরা সাপের খোঁজে বেরোয়। এই 'রিসেস'-এর সময়েই যতো গান, বাজনা, নাচ, ঝুমুর সবই। কৃষিভিত্তিক জীবনের লাভালাভের খতিয়ান ঐ তিন মাসের যাবতীয় সাংস্কৃতিক প্রকাশে ধরা পড়ে।"[৫৩]

এই কথা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিজন ভট্টাচার্যের লোকায়ত জীবন সম্পর্কে আগ্রহ এবং অভিজ্ঞতার শিকড় কতটা গভীরে প্রোথিত!

বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাটকের মধ্যে 'cultural cell'-টিকে খুঁজেছেন, প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন জীবন-সংগ্রামের প্রবাহমান ধারাটিকে। তিনি দেবীগর্জন নাটকের ভূমিকায় সে-কথা জানিয়েছেন—

> "কৃষিভিত্তিক বাংলার সাংস্কৃতিক রূপরেখায় শ্রেণি-সংগ্রামের অনিবার্যতা স্বীকার করে নিয়েই নিগূঢ় সেই cultural cell-টিকে আমাদের খুঁজে পেতে হবে এবং প্রাণ-চৈতন্যের বহতা অক্ষুণ্ণ রেখে বর্তমান জীবন সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষণিকতায় তার নিরাকরণ করতে হবে।"[৫৪]

কেননা বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যভাবনার কেন্দ্রে নিহিত ছিল বাংলার বিস্তৃত গ্রামীণ জীবন এবং সেই জীবনের গভীরে থাকা লোকায়ত জীবন-দর্শনকে তুলে ধরা, প্রকাশ করা। সে-কথা আরো স্পষ্টভাবে তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানান —

> "আমাদের যেতে হবে গ্রামের অবজেক্টিভ রিয়্যালিটি-তে। উই হ্যাভ্ টু রিমডেল দেয়ার কালচারাল ফর্মজ্ অন দ্য বেসিস অব দেয়ার ওন আন্ডারস্ট্যানডিং।"[৫৫]

'দেবীগর্জন' নাটকে তিনি 'গ্রামের অবজেক্টিভ রিয়্যালিটি'-কে তুলে ধরলেন লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান ও আঙ্গিকের নিরিখে। সেই ভাবনা থেকেই তিনি পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে এই নাটকে 'স্মল পার্লামেন্ট'[৫৬] হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। যদিও এই ধারণাটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন তর্জার ফর্ম থেকে, যা তাঁর গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতায় ধরা ছিল। কবির লড়াই কিংবা তরজার আঙ্গিককে পঞ্চায়েত সভার মধ্যে ব্যবহার করে একটি বিশেষ সমাজ, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর নানা সমস্যাকে তুলে আনলেন নাটকে। এ-প্রসঙ্গে তিনি নিজেই জানিয়েছেন—

> "তরজার form-টা debate-এর, fighting cultural reaction and prejudice. তার সঙ্গে সঙ্গে চাই new things, new models."[৫৭]

পাশাপাশি এই নাটকে বাংলা লোকনাট্য, লোকগীতি, লোকনৃত্য, লোকক্রিড়া ও লোকভাষার সমন্বয় ঘটিয়ে নাট্যকার একটা Plural Society-কে হাজির করেছেন। অন্যদিকে বিজন ভট্টাচার্য একাধিক দেব-দেবীর মিশ্রণের (দুর্গা কালী মনসা ধর্মঠাকুর) মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে (মংলা বাউরি সম্প্রদায় ও সঞ্চারিয়া সাঁওতাল সম্প্রদায়) ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছেন এবং তাদের লোকায়ত ধর্ম বিশ্বাস সংস্কার ও সংস্কৃতিকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে "Form জন্ম নেয় content-এর pressure-এ।"[৫৮] এই 'content-এর pressure'-টাই ছিল তাঁর কাছে 'যুগসত্য' ও 'যুগযন্ত্রণা'। সে কারণেই তিনি 'জীবনবোধ' দিয়ে 'এক দুঃসহ জীবন যন্ত্রণা' ও 'যুগযন্ত্রণা'কে 'যুগসত্য'-র নিরিখে উপলব্ধি করে শুধুমাত্র 'photographic reality'[৫৯]-কে নয়, নাটকে ধরতে চেয়েছিলেন (লোকায়ত মানুষের) 'how to reach these agony'[৬০]-কে। পাশাপাশি তিনি মনে প্রাণে এটাও বিশ্বাস করতেন —

> "Theatre is not bound with in any laws, any sacred spells, any predetermined routes."[৬১]

যে কারণেই তিনি তাঁর নাটকে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নির্দিষ্ট কাঠামোতে গড়ে ওঠা নিয়মবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রচলিত নাট্যরীতিকে অনুসরণ না করে গণনাট্য পর্বে এবং গণনাট্য পরবর্তী সময়ে পর্বের 'যুগসত্য' (ঐতিহাসিক ঘটনা) এবং 'যুগযন্ত্রণা'-র (জীবনাভিজ্ঞতা ও সমকালীন সমস্যা) নিরিখে 'সাংস্কৃতিক বামপন্থা'র মতাদর্শে জারিত নিজস্ব একটা নাট্যভাষা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে তিনি তাঁর নাট্যরীতি নির্মাণের ব্যাপারে যে বিষয়ে সচেতন ছিল তা হল—

> "My themes have never allowed me the luxury of the Aristotelian discipline."[৬২]

বিজন ভট্টাচার্য যেমন তাঁর নাট্যরীতিতে 'Aristotelian discipline'-কে গ্রহণ করেননি, তেমনই ব্রেখ্টের মতো 'illusion break'[৬৩]-ও করতে চাননি। তাই তিনি বৃহত্তর জনসাধারণের কথা মাথায় রেখে 'how to utilise these myths to create new models beyond the myth'[৬৪] -এর মধ্য দিয়ে বিকল্প একটা নাট্যভাষা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কেননা তিনি জানতেন 'if we break the myths, their hearts will be broken', তাই তিনি 'traditional literary forms'-কে গ্রহণ না করে 'folk ritualistic or musical forms'[৬৫]-কে তাঁর নাটকের প্রস্থানভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। অন্যদিকে বিশেষ রাজনৈতিক ভাবাদর্শে ('রাজনৈতিক বামপন্থা') গড়ে ওঠা নিজস্ব সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া বা দর্শনের ('সাংস্কৃতিক বামপন্থা') মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য প্রেরণা সঞ্চয় করেছিলেন লোকজীবন তথা লোকসংস্কৃতির ('দীনসংস্কৃতি') শিকড় থেকে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক তথা সমাজেতিহাসের সমকালীন ঘটনাকে সামনে রেখে বৃহত্তর লোকায়ত প্রেক্ষিতে তিনি লোকায়ত মানুষের যেমন সংগ্রামকে দেখাতে চেয়েছেন তেমনই তাদের উত্তরণের সম্ভাব্য পথ চিহ্নিত করে নাটকের একটা বিকল্প প্রস্থানভূমি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন।

সংকেতসূচি :

সং ও বি. - সংকলন ও বিন্যাস। বি.দ্র. - বিশেষ দ্রষ্টব্য। দ্র. - দ্রষ্টব্য। পৃ. - পৃষ্ঠা।সম্পা. - সম্পাদনা/সম্পাদিত। ব. - বঙ্গাব্দ। এ. পৃ. স. উ. - এভাবেই পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখিত। প. রা. ক. - পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, 'ভূমিকা', বিজন ভট্টাচার্য, রচনাসংগ্রহ ১, (সম্পা.) নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ, জুলাই ২০০৮, পৃ. ১০ [এ. পৃ. স. উ.]
[বি.দ্র. পরবর্তী তথ্যসূত্রে গ্রন্থটি রচনাসংগ্রহ ১ বলে উল্লেখ করা হবে]

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০[এ. পৃ. স. উ.]

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, 'মুখবন্ধ', শতবর্ষীয়ান জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, শিবাদিত্য দাশগুপ্ত ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, থীমা, ২০১৫, পৃ. ৭ [এ. পৃ. স. উ.]
[বি.দ্র. পরবর্তী তথ্যসূত্রে গ্রন্থটি শতবর্ষীয়ান জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বলে উল্লেখ করা হবে]

৪. ১৯৭২ সালে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে বিজন ভট্টাচার্য তাঁর পিতার নাম জানিয়েছিলেন ক্ষীরোদচন্দ্র ভট্টাচার্য। পরে তা 'জনসাধারণের আমি' শিরোনামে প্রথম প্রমা পত্রিকায় (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৭৮) প্রকাশিত হয়। অনেক পরে তা বিশিষ্ট বিজন (জুন ২০০৫) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিজন ভট্টাচার্য সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থে— নট নাট্যকার নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য: একটি আলেখ্য, (১৯৯৩, পৃ. ৯) এবং গন্ধর্ব (আশ্বিন ১৩৮৪ ব.) পত্রিকায় প্রকাশিত অধীর সেনের 'বিজন ভট্টাচার্য: নাট্যজীবনের রূপরেখা' শীর্ষক জীবনপঞ্জিতে বিজন ভট্টাচার্যের পিতার নাম 'ক্ষীরোদবিহারী' উল্লেখ্য করা হয়েছে। পৃ. ৬

৫. রায়চৌধুরী, সজল (লেখা) ও নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পা.), নট নাট্যকার নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য : একটি আলেখ্য, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৯৯৩, পৃ. ৯

৬. ভট্টাচার্য, বিজন, 'জনসাধারণের আমি', বিশিষ্ট বিজন, (সং ও বি.) শিবাদিত্য দাশগুপ্ত, প্রথম সংস্করণ, মনফকিরা, কলকাতা, জুন ২০০৫, পৃ. ৪৯ [বি. দ্র. পরবর্তী তথ্যসূত্রে গ্রন্থটি বিশিষ্ট বিজন বলে উল্লেখ করা হবে]

৭. সাহা, নৃপেন্দ্র (সম্পা.), নট নাট্যকার নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য : একটি আলেখ্য, পৃ. ৯

৮. ভট্টাচার্য, বিজন, 'জনসাধারণের আমি', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ৪৯

৯. এই প্রসঙ্গে সৌমিত্র বসু এক প্রবন্ধে জানিয়েছেন— "মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি (বিজন ভট্টাচার্য) 'ওথেলো' আবৃত্তি করতে পারতেন।" [দ্র. সৌমিত্র বসু, 'নাটকের বিজন : একটি অসম্পূর্ণ পর্যালোচনা', শতায়ু বিজন, (সম্পা.) কুন্তল মিত্র ও ফণিভূষণ মণ্ডল, প্রথম প্রকাশ, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, বইমেলা ২০১৮] পৃ. ৮১

১০. ভট্টাচার্য, বিজন, 'জনসাধারণের আমি', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ৪৯

১১. সুবর্ণপ্রভা দেবী সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য বিজন ভট্টাচার্যের লেখাপত্তর ও সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় না। তবে এটা জানা যায় যে, তাঁর বড়মামা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার আনন্দবাজার পত্রিকা-র সম্পাদক ছিলেন। এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, তাঁর মা সুবর্ণপ্রভা দেবী সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বোন ছিলেন। ফলে ওই পরিবারের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রুচি যে তাঁর মায়ের মধ্যেও ছিল এটা খুব সহজেই অনুমান করা যায়।

১২. ভট্টাচার্য, বিজন, 'জনসাধারণের আমি', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ৪৯

১৩. ঐ, 'বাংলা থিয়েটারে গণনাট্যের ভগীরথ এখনো সক্রিয়' (একটি সাক্ষাৎকার), গন্ধর্ব, (সম্পা.) নৃপেন্দ্র সাহা, আশ্বিন ১৩৮৪ ব., পৃ. ৪৩ [বি.দ্র. পরবর্তী তথ্যসূত্রে পত্রিকাটি গন্ধর্ব বলে উল্লেখ করা হবে]

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

১৫. ভট্টাচার্য, বিজন, 'জনসাধারণের আমি', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ৫০-৫১

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

১৭. ভট্টাচার্য, বিজন, 'ক্রাইসিসে এ-ই হয় এবং এ-ই হচ্ছে', বিশিষ্ট বিজন, পৃষ্ঠা ৮৫

১৮. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, 'নীলকণ্ঠ তুমি, তুমি অভিমন্যু' (শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্য চিরঞ্জীবেষু), 'মানুষ বড়ো কাঁদছে' (নভেম্বর ১৯৭৮), শ্রেষ্ঠ কবিতা, একাদশ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৬৭

১৯. ভট্টাচার্য, বিজন, 'নবান্ন ও আজ', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ৪৮

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮
২৩. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, লোকায়ত দর্শন, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, নিউ এজ, ১৩৬৩ ব., পৃ. ৪৯ [বি.দ্র. পরবর্তী তথ্যসূত্রে গ্রন্থটি লোকায়ত দর্শন বলে উল্লেখ করা হবে]
২৪. 'গণনাট্য সংঘের ঘোষণাপত্র', গ্রুপ থিয়েটার, বর্ষ ৪, সংখ্যা ১, শারদীয় ১৯৮৮, পৃ. ৮৪
২৫. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, লোকায়ত দর্শন, পৃ. ৪৯ - ৬৩
২৬. ভট্টাচার্য, বিজন, 'জবানবন্দী' (৪র্থ দৃশ্য), বহুরূপী ৩৪, জুন ১৯৭০, পৃ. ৩১
২৭. ভট্টাচার্য, সুকান্ত, 'শত্রু এক', 'ছাড়পত্র', রচনাসমগ্র, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ, ২০১৪, পৃ. ৮৯
২৮. '১৯৪৩ বাংলা' দুর্ভিক্ষ নামক বিখ্যাত চিত্রাবলীর শিল্পী ছিলেন জয়নুল আবেদিন। যার মধ্যে 'ম্যাডোনা ১৯৪৩' ছবিটির জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে যান। অন্যদিকে চিত্তপ্রসাদ ১৯৪৩ সালে মেদিনীপুরের দুর্ভিক্ষের যে চিত্র আঁকেন তা সর্বকালীন দুর্ভিক্ষের প্রতিচ্ছবি হয়ে আছে।
২৯. মিত্র, অশোক, 'অমিত্রাক্ষর', আরেক রকম, কালীকৃষ্ণ গুহ সম্পা, তৃতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ১- ১৫ এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ২১
৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
৩৩. মিত্র, অশোক, 'শতবর্ষে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র', শতবর্ষীয়ান জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, পৃ. ১
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১
৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, 'মুখবন্ধ', শতবর্ষীয়ান জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, পৃ. সাত [এ. পৃ. স. উ.]
৩৬. ঐ, 'সাংস্কৃতিক বামপন্থার পরিপ্রেক্ষিতে গণনাট্য চিন্তা : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য ও প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে', গণনাট্য ৭০, (সম্পা.) বাবলু দাশগুপ্ত, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, প. রা. ক., প্রথম প্রকাশ, ২৫ মে ২০১৫, পৃ. ৮২ [বি. দ্র. পরবর্তী তথ্যসূত্রে গ্রন্থটি গণনাট্য ৭০ বলে উল্লেখ করা হবে]
৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩
৩৮. ভট্টাচার্য, বিজন, 'জনসাধারণের আমি', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ৬৬
৩৯. ঐ, 'গণনাট্য আন্দোলনের সেকাল ও একাল', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ১৭
৪০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, 'সাংস্কৃতিক বামপন্থার পরিপ্রেক্ষিতে গণনাট্য চিন্তা : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য ও প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে', গণনাট্য ৭০, পৃ. ৮৪
৪১. ভট্টাচার্য, বিজন, 'বাজারের সত্যি একটা ভয়ানক সত্যিই', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ৯০
৪২. ঐ, 'জনসাধারণের আমি', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ৬৫
৪৩. ঐ, 'মনে হয় একটা ক্রুসেড আরম্ভ করে দিই', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ৭৩
৪৪. ঐ, 'জনসাধারণের আমি', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ৬৫
৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫
৪৬. মৈত্র, জ্যোতিরিন্দ্র, 'আমাদের বিজন', রচনা সংগ্রহ ১, পৃ. ১৪৭
৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭
৪৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, 'নবান্ন-এর ধারা থেকে অন্য ধারায়: একটি অসম্পূর্ণ আলোচনা', বহুরূপী ৩৪, চিত্তরঞ্জন ঘোষ (সম্পা.) নবান্ন স্মারক সংখ্যা (দ্বিতীয় সংকলন), জুন ১৯৭০, পৃ. নব্বই [এ. পৃ. স. উ.]

৪৯. ঐ, 'ভূমিকা', বিজন ভট্টাচার্য, রচনাসংগ্রহ ১, পৃ. বারো-তেরো [এ. পৃ. স. উ.]
৫০. বিজন ভট্টাচার্য, 'ভূমিকা', 'নবান্ন', রচনাসংগ্রহ ১, পৃ. ৩৭
৫১. ঐ, 'নবান্ন' (৩য় অঙ্ক / ২য় দৃশ্য), রচনাসংগ্রহ ১, পৃ. ৯৭
৫২. ঐ, 'ভূমিকা', নবান্ন, প্রথম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ২৭-২৮
৫৩. ঐ, 'অভিজ্ঞতার থিয়েটার', গন্ধর্ব, পৃ. ১৩
৫৪. ঐ, 'ভূমিকা', দেবীগর্জন, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৩৮
৫৫. ঐ, 'জনসাধারণের আমি', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ৬৭
৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
৫৯. ভট্টাচার্য, বিজন, 'নাটক ও নাট্যপ্রবাহ ১৯৭০: সম্ভাব্য গতিপ্রকৃতি', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ৯৯
৬০. ঐ, 'জনসাধারণের আমি', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ৬৪
৬১. ঐ, 'Theatre and Social Realism', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ১১১
৬২. ঐ, 'The Crisis of the Artist', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ১১৫
৬৩. ঐ, 'নাটক ও নাট্যপ্রবাহ ১৯৭০: সম্ভাব্য গতিপ্রকৃতি', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ৯৯
৬৪. ঐ, 'বাজারের সত্যি একটা ভয়ানক সত্যি', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ৮৯
৬৫. ঐ, 'The Crisis of the Artist', বিশিষ্ট বিজন, পৃ. ১১৫